দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...11.MAR..1997 ......
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৬ ......

16

সরকারি বনাম বেসরকারি স্কুল

প্রজ্ঞা লাবনী

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড; অর্থাৎ কিনা যার সাহায্যে একটা জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের সেই মেরুদন্ড এখন রোগাক্রান্ত– মামুলি বাত, ক্যান্সার না এইড্‌স্‌ তা নির্ণয় করে, অনতিবিলম্বে চিকিৎসা না করতে পারলে, একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে যাবে যেকোন সময়ে। মৃত্যুরও আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরাসরি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে– সরকারি ব্যবস্থা আর বেসরকারি ব্যবস্থা। সরকারের একান্ত অভিভাবকত্বের আওতাধীন দেশের সমস্ত স্কুলই হলো সরকারি স্কুল। বেসরকারি স্কুল বলতে, ইদানীং আমরা বুঝি দেশের সব কিন্ডারগার্টেনসহ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তবে এক সময়ের অগ্রণী, হলিক্রস, ভিকারুন্নেসা, ইস্পাহানি প্রভৃতি বিদ্যালয় যা শুরুতে পুরোপুরি ইংলিশ মিডিয়াম থাকলেও পরে তা বাংলা মাধ্যমে পরিণত হয় এবং এগুলোও সব বেসরকারি স্কুল।

বর্তমানে দেশে, বিশেষ করে রাজধানী শহরে, ব্যাঙের ছাতার চাইতেও বেশি মাত্রায় গড়ে উঠছে এইসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। যেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই কিন্ডারগার্টেন নামে শুরু হয়ে, ধাপে ধাপে ক্লাস বাড়িয়ে 'ও' লেভেল পর্যন্ত পৌঁছেছে। অনেকগুলো আবার কিন্ডারগার্টেন হিসেবেই রয়ে গেছে। এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা ২০ হাজারের মত (সংবাদ ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি '৯৭) অথচ সেই তুলনায় সরকারি স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই কম।

এইসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করছে প্রায় ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী। যারা এইসব স্কুলে পড়ে, তারাই কেবল জানতে পারছে তাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সম্পর্কে। কেমন এসব স্কুল? বেশিরভাগ স্কুলই একটা আবাসিক বাড়ির মধ্যে ঠেসে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যেখানে, পারলে রান্নাঘরটিও ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপরিসর, অন্ধকার, বাতাসহীন শ্রেণীকক্ষ। ছোট রুমে, ঠাসাঠাসি করে ছেলেমেয়েরা বসছে। অনেক ক্লাসে যেদিন সব ছেলেমেয়ে উপস্থিত থাকে, সেদিন তাদের নড়াচড়া করার মত অবস্থা থাকে না। এমনকি টিচার ক্লাসে ঢুকে স্বাচ্ছন্দ্যে হেঁটে চলে পড়াতেও পারেন না। সব ক্লাসে সিলিং ফ্যান নেই। থাকলেও তা অপর্যাপ্ত। যেখানে ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা নেই, সেখানে প্যাডেস্টাল ব্যবহার (floor fan) ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তা টিচারদের দিকেই ঘুরিয়ে রাখা হয় প্রায়শঃই, ক্লাসের ছেলেমেয়েরা হয় বঞ্চিত।

এ তো গেল স্কুল ভবনের ব্যাপার স্যাপার। এদের সিলেবাস আরও চমকপ্রদ বিষয়। প্রত্যেক স্কুলের নিজস্ব নির্মিত সিলেবাস, নিজেদের সুবিধা–অসুবিধা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ানো হয় তৃতীয় শ্রেণীর বই এবং বই–খাতার বহর দেখলে মনে হয়, সারা জনমের সব পড়া এই ক্লাস ওয়ানেই শেষ করতে হবে। পড়ার চাপে বাচ্চা ক্লিষ্ট, ক্লিষ্ট তার মাতা–পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। এইভাবে উঁচু ক্লাসের বই পড়িয়ে এবং তীব্র চাপ সৃষ্টি করে এক ধরনের গর্ববোধ অনুভব করে থাকেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এসব স্কুলের মাঝে সূক্ষ্ম এক প্রতিযোগিতা চলতে থাকে, কারা কত কঠিন বই তাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত করেছে, এই নিয়ে। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খড়ের প্রাণ হারায়" স্কুল কর্তৃপক্ষের এই স্নায়ুযুদ্ধের শিকার ছোট–নিরীহ–অসহায় শিশুরা। আরও একটি অভিনব বিষয় হল, এই সমস্ত স্কুলের বেশির ভাগ পাঠ্যবই ভারতে মুদ্রিত। ভূগোল পড়তে গিয়ে বাচ্চাদের জানতে হচ্ছে কার্নাটকে কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়? দিল্লীর আবহাওয়া কেমন ইত্যাদি। নিজের দেশের ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি কিছুই তারা জানতে পারছে না। ঐসব বই আবার দেড়গুণ দামে কিনতে হচ্ছে; দারুণ এক ব্যবসা! কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয়, আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের এইসব স্কুলের জন্য পাঠ্যবই লেখার কোনই যোগ্যতা নেই? কারো নেই? একথা বিশ্বাস করতে হবে?

বেসরকারি এই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি, আমার সঠিকভাবে জানা নেই। 'ও' লেভেলের ছাত্র–ছাত্রী (ছাত্রীই বেশি) স্কুল থেকে পাস করে, আবার নিজের স্কুলে অনেক সময় শিক্ষাদান করছে। অনেক টিচার ম্যাট্রিক পাস, কেউ বি,এ পাস, তবে অবশ্যই এম,এ পাসও রয়েছেন প্রচুর। এদের জন্য টিচার্স ট্রেনিং কোর্স বাধ্যতামূলক কিনা, জানি না। অনেক স্কুলে শিক্ষকদের ভাল সম্মানী দেয়া হয়, যেমনভাবে ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে ভাল বেতন নেয়া হয়, সেই অনুপাতে।

এই সমস্ত স্কুলের বেতন হলো (ছাত্র–ছাত্রীর বেতন) সবচাইতে বেশি।

প্রায় প্রতি বছর স্কুল কর্তৃপক্ষ বেতন বাড়িয়ে চলছে, বিনিময়ে কোনই বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে না। অথচ বেতন বাড়ছে তো বাড়ছেই। এর বিরোধিতা করার সাহস বা ইচ্ছে কোন অভিভাবকের ছিল না বলেই এতদিন ধারণা ছিল। কিন্তু গত বছর "প্রে–প্যান" স্কুলের বেতন ১০০% বাড়ানো হলে, কিছু সংখ্যক সচেতন অভিভাবক একত্র হয়ে এর বিরোধিতা করেন। ফলস্বরূপ স্কুল কর্তৃপক্ষ তার স্বেচ্ছাচারিতা অনেকাংশে বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এর সুফল এখন ভোগ করছে অন্যসব বাচ্চাদের অভিভাবকগণ, যারা আন্দোলনে শরিক হয়নি, অথচ সুবিধা ভোগ করছে সদর্পে। ওদিকে আন্দোলনকারী কিছু সংখ্যক বাচ্চা হয়েছে এর শিকার, পরিণতিতে তাদের স্কুল ছাড়তে হয়েছে। আসলে, যতদিন সবাই নিঃস্বার্থ–নির্ভীকভাবে একত্র না হতে পারবে, ততদিন এ সমাজের, তথা এ দেশের কল্যাণকর কিছুই সাধন করা সম্ভব হবে না। তবে, এটা অবশ্যই একটা শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য স্কুলগুলোর জন্য। কিন্তু তবুও, এ সমস্ত স্কুল ব্যবসায়িক সফলতার দিকে অতিমাত্রায় আগ্রহী বলেই সরকারের সর্বাগ্রে উচিত এসব স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট বেতন নির্ধারণ করে দেয়া এবং প্রয়োজনে শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতি হলে, বেতন বাড়ানো হবে, নতুবা একটি পয়সাও বাড়বে না। শুধু তো আর মাসান্তে স্কুল বেতন নয়, মিলাদে টাকা, পিকনিকে টাকা, মিনাবাজারে টাকা, শিক্ষা সফরে টাকা, কিসে না টাকা? এ নিয়ে কে চাইবে কার কাছে কৈফিয়ত? Re-admission fees নামে প্রতি বছরের শুরুর শুভক্ষণে একগাদা টাকা দিতে হবে। ছাত্র তো আর স্কুল ছাড়ছে না। তাহলে আবার admission নেয়া কেন? আর এই টাকার ব্যবহার হচ্ছে কোন খাতে, তাও কারো জানবার জো নেই। বিচিত্র এক একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থা!

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, 'ও'–'এ' পাস করে, খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট বা অন্যান্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে। এর পেছনের সঠিক কারণ আমার জানা নেই। তাহলে, দেশে প্রতিনিয়ত গড়ে ওঠা এই ধরনের স্কুলের প্রয়োজনীয়তা আদৌ কতখানি, তা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ভাববার সময় এসে গেছে। সরকারের সুনজরে আনতে হবে এই সমস্ত স্কুলের সব ধরনের কার্যকলাপ। Scrutiny করে এ সমস্ত স্কুলের স্বীকৃতি প্রদানে আরও নিরপেক্ষ সচেতন কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। স্কুলের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, পাঠ্যসূচি, পঠন পদ্ধতি, পোশাক, বেতন, ছুটি ইত্যাদি সব কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তাহলেই সরকারি আর বেসরকারি স্কুলের মধ্যকার আকাশছোঁয়া দূরত্ব অনেকাংশে ঘুচে যাবে।

আরেকটি জরুরি বিষয় মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচরে আনতে চাই, তা হলো পাড়ায় পাড়ায় আরও সরকারি স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ধানমন্ডি এলাকার জন্য স্বাধীনতা–উত্তর দেশে একটি স্কুল হয়তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে সরকারি স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে কি? সরকারি স্কুলের বিশাল প্রাঙ্গণসহ, পরিকল্পিত প্রশস্ত স্কুল ভবন, সহজলভ্য পাঠ্য পুস্তক, ন্যায়সঙ্গত বেতন, যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ আমাদের সবারই রয়েছে। কারণ, আমাদের অনেকেরই সরকারি স্কুলের স্বাভাবিক–সুন্দর পরিবেশে স্কুলজীবন কেটেছে। বর্তমান অবস্থায়, যাদের বেশি ছেলেমেয়ে, তাদের সবক'টি সন্তানকে এই সমস্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াতে যে কী পরিমাণ নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, তা শুধু তারাই জানেন। তার উপর সেই ক্লাস ওয়ান থেকেই তো শুরু হয় প্রাইভেট পড়ানোর ধাক্কা। এদেশে কটা পরিবার আছে, যারা এই অর্থনৈতিক চাপ নির্দ্বিধায় বহন করতে পারে? অথচ, স্বল্প বেতনের সরকারি স্কুলেও বাচ্চাদের পড়াতে চাইছে না, কারণ অভিযোগ একটাই– সেখানে লেখাপড়া হয় না। তার উপর বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করাতো রীতিমত যুদ্ধ করা, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাইতে কম কিছু নয়।

অথচ সরকারি স্কুলের সংখ্যা বাড়লে, ছাত্রের চাপ কমবে, ভর্তি করা সহজ হবে। আর সেই সাথে সরকারি হস্তক্ষেপে শিক্ষকরা আরও একটু আন্তরিক ও কর্মঠ হলেই সরকারি স্কুলগুলো তার পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পাবে, যা আমাদের অনেকেরই কাম্য।